বঙ্গবন্ধু হত্যা: প্রতিবাদী আন্দোলনের চাপা পড়া ইতিহাস

মুহাম্মদ শামসুল হক

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে নৃশংসভাবে হত্যা পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে মর্মস্পর্শী ও জঘন্য ঘটনা। দানবচক্র বঙ্গবন্ধু ছাড়াও তাঁর পরিবারের অন্য সদস্য-সদ্যবিবাহিত পুত্রবধূ, এমনকি ছয়-সাত বছর বয়সি শিশু রাসেলসহ নিকটাত্মীয়, যাঁদের হাতের নাগালে পেয়েছে তাঁদেরও নির্মমভাবে হত্যা করে। সেদিন বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর ছোটো বোন শেখ রেহানা দেশের বাইরে থাকায় ঘাতকের বুলেট তাঁদের ছুঁতে পারেনি।

লক্ষ্য করা গেছে, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার দাবি এবং শাস্তি প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু হলে এমনকি বর্তমানেও কিছু লোক এই বলে অপপ্রচার চালান যে, বঙ্গবন্ধুর মতো অবিসংবাদিত নেতার হত্যাকাণ্ডের পর কোথাও কোনো প্রতিবাদ-প্রতিরোধ হয়নি। তারা বোঝাতে চান যে, ৭৫ সাল নাগাদ বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তা অত্যন্ত কমে গিয়েছিল। তাই নিজ দলের নেতা-কর্মীরাও তাঁর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর টু শব্দ পর্যন্ত করেননি। আসলে এমন অপপ্রচারের মাধ্যমে তারা নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত এবং বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তাকে খাটো করে দেখাতে চান।

অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তির অবস্থান ও সামরিক ব্যক্তির পৈশাচিক কর্মকাণ্ডের আকস্মিকতায় সাধারণ মানুষসহ অনেক নেতা-কর্মীর মধ্যে প্রথমে বিভ্রান্তি দেখা দিলেও দেশের অনেক জায়গায় সেদিনই প্রতিবাদ মিছিল হয়েছিল। পরবর্তী দু-তিন মাসের মধ্যে দেশের একটি বড়ো অংশ জুড়ে গড়ে উঠেছিল বৃহত্তর প্রতিবাদ-প্রতিরোধ কর্মসূচি যা একাত্তরের গেরিলা যুদ্ধের রূপ নিয়েছিল। তবে এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে তাৎক্ষণিক নির্দেশনা না পাওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর পরিসরে প্রতিরোধ গড়ে না ওঠার কারণগুলোও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

যেমন: ১৫ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর আগমনকে ঘিরে কর্মসূচির পরের দিন ছিল নবগঠিত জাতীয় যুবলীগের নেতা-কর্মীদের সম্মেলন ও পরিচিতি অনুষ্ঠান। এ উপলক্ষ্যে সারা দেশের জেলা পর্যায়ের শীর্ষ নেতারা অবস্থান করছিলেন ঢাকায়। অর্থাৎ সাংগঠনিকভাবে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ডাক দেওয়ার মতো লোকজন জেলা পর্যায়ে ছিলেন না বল্লেই চলে। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ঘেঁটে জানা যায়, বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র যে চলছিল তা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যস্তরের একাধিক কর্মকর্তাসহ দেশি-বিদেশি শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনেকে তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। নেতাদেরও কেউ কেউ তাঁকে ৩২ নম্বর বাড়ির নিরাপত্তাহীনতার কথা ভেবে গণভবনে থাকার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তিনি সরল বিশ্বাসের কারণে কারো কথাই শোনেননি এবং কোনোরূপ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে প্রশাসন বা দলীয় নেতা-কর্মীদের কোনো নির্দেশনা দেননি।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের খবর পাওয়ার পর পরিস্থিতিতির কারণে শীর্ষ পর্যায়ের কাউকে পাওয়া না গেলেও স্থানীয় নেতা-কর্মীরা পরস্পর যোগাযোগের মাধ্যমে ঐদিনই তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল বের করেছিল দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর চট্টগ্রাম, বরগুনা ও কিশোরগঞ্জসহ বিভিন্ন এলাকায়। ঘটনার প্রথম দিনেই চট্টগ্রাম বেতারকেন্দ্র দখল করে জনগণকে প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আহ্বান জানানোর উদ্যোগও নেওয়া হয়। কিন্তু প্রবীণ নেতাদের কেউ কেউ অসংগঠিত ও নিরস্ত্র অবস্থায় এ ধরনের কর্মকাণ্ড ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় সম্মত না হওয়ায় উদ্যোগটি বাতিল হয়।

৩-৪ দিনের মাথায় মিছিল হয় ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে। ছাত্র-কর্মীদের চেষ্টার ফলে ২০ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর কেন্টিন ও কলাভবন এলাকায় চলে সমাবেশ, মিছিল-স্লোগান। পরদিন আবারও মিছিল করতে গিয়ে সামরিক সরকারের সমর্থক ও পুলিশি হামলার শিকার হন ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা। এরই মধ্যে গোপনে সংগঠিত হয়ে ৪ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আশপাশের এলাকা ঘিরে মিছিল সমাবেশ, দেয়াল লিখন ও পোস্টারিংয়ের মাধ্যমে প্রতিবাদী কর্মসূচি পালন করে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নসহ বাকশালভুক্ত ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। এ সময় ৩২ নম্বরে

বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। এতে শিক্ষার্থী ছাড়াও বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ অংশ নেয়। সেখানে উপস্থিত অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। ওই দিন চট্টগ্রামেও কয়েক জায়গায় মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিল হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ ছাড়া শেরপুর, পাবনা, ভৈরব, মুক্তাগাছায় প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত হয়। তবে সবকটি মিছিল সমাবেশই পুলিশ ও সেনাবাহিনীর বাধার কারণে সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছিল। কোথাও কোথাও সেনাবাহিনীর হামলার কারণে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এরই ফাঁকে ঘনিষ্ঠজনদের নিয়ে সশস্ত্র প্রতিরোধের লক্ষ্যে সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে ময়মনসিংহের সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থান নেন মুক্তিযোদ্ধা আবদুল কাদের সিদ্দিকী বিরোত্তম। একইরকম চিন্তা নিয়ে সংগঠিত হচ্ছিলেন বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠপুত্র শহীদ শেখ কামালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ঢাকা মহানগর ছাত্রলীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ও পরে জাতীয় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সদস্য সৈয়দ নুরুল ইসলাম নুরুসহ বিভিন্ন কলেজ ও অন্যান্য অঞ্চলের ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। নভেম্বরে পর্যায়ক্রমে তাঁরাও গিয়ে যোগ দেন কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে। গঠিত হয় জাতীয় মুক্তিবাহিনী। অল্পসংখ্যক বঙ্গবন্ধুপ্রেমিক সদস্য নিয়ে এই বাহিনী কাজ শুরু করলেও গোপন সাংগঠনিক তৎপরতার ফলে এক বছরের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ৬-৭ হাজার, কারও কারও মতে, আরও বেশি প্রতিবাদী যোদ্ধা এতে যুক্ত হন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছিলেন একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধা। ছিলেন নারায়ণগঞ্জের নাসিম ওসমান (পরে সংসদ সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী), আবদুল লতিফ সিদ্দিকী (প্রাক্তন মন্ত্রী), তৎকালীন ছাত্রলীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক দীপঙ্কর তালুকদার (বর্তমান এমপি), নগর ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক আবদুর রউফ সিকদার, ঢাকা আইডিয়াল কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সামাদ পিন্টু, শামীম মোহাম্মদ আফজাল (প্রয়াত মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন), জাতীয় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সদস্য সেলিম তালুকদারসহ অনেকে।

প্রতিরোধ যোদ্ধারা নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, সুনামগঞ্জ, শেরপুর, জামালপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট জেলার সীমান্ত এলাকায় অবস্থান নিয়ে কখনো বাংলাদেশ, কখনো ভারতের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে সেনাবাহিনী ও বিডিআরের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তাদের একটি গ্রুপ খন্দকার মোশতাক আহমদকে হত্যা করার জন্য ঢাকা এসে ধরা পড়ায় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারেননি।

একইভাবে চট্টগ্রামের তৎকালীন ছাত্র ও যুবনেতা, একাত্তরে চট্টগ্রাম শহর গেরিলা বাহিনীর প্রধান মৌলভি সৈয়দ আহমদ, এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী (চট্টগ্রামের প্রয়াত সিটি মেয়র), যুদ্ধকালীন বিএলএফের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার এসএম ইউসুফ তাঁদের অনুসারীদের সংগঠিত করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধমূলক নানান কর্মসূচি গ্রহণ করেন। অনেক মুক্তিযোদ্ধাসহ যুব ও ছাত্রলীগের কয়েকশ নেতাকর্মী ক্রমান্বয়ে এ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হন। এঁদের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় মূলত চট্টগ্রাম মহানগরসহ বিভিন্ন থানা এলাকায়। মৌলভি সৈয়দ একটি কমান্ডো গ্রুপ নিয়ে লিবিয়া গিয়ে খুনিদের হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। ৭৭ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত চলমান ওই যুদ্ধে দুপক্ষেরই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য হতাহত হয়। দেশের ভেতরেও স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে কিছু কাজ করেছেন তাঁরা।

প্রতিবাদ মিছিল সমাবেশ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের শুরুর দিক থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্তদের মধ্যে ছিলেন, আ র ম উবায়দুল মুকতাদির (বর্তমানে সংসদ সদস্য), ছাত্র ইউনয়ন নেতা মাহবুব জামান, সাজেদা চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক, এস এ মালেক, ওবায়দুল কাদের, ইসমত কাদির গামা, বাহলুল মজনু চুন্নু, খ ম জাহাঙ্গীর, চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সিরাজুল হক মিয়া, আবদুল্লা আল হারুন চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু, এম এ মান্নানসহ অনেকে।

তবে প্রতিবাদী প্রতিরোধ যোদ্ধাদের রণকৌশলে কিছুটা ভিন্নতা ছিল বলে জানা যায়। কারও কারও লক্ষ্য ছিল হত্যাকারী ও তাদের মদতদাতা সামরিক কর্তপক্ষকে সশস্ত্র উপায়ে হটিয়ে নিজেদের কর্তৃত্বে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করা। অন্যদিকে অনেকের লক্ষ্য ছিল কিছুটা সশস্ত্র কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সরকারকে ব্যতিব্যস্ত রাখার পাশাপাশি এলাকাভিত্তিক বৈঠক-সমাবেশ, লিফলেট বিতরণ, দেয়াল লিখন ইত্যাদির মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি করা-যাতে জনমনে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনার পুনর্জাগরণ ঘটিয়ে দলকে সংগঠিত করে ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়। সে সময় পোস্টারে-মিছিলে স্লোগান ছিল ‘এক মুজিব লোকান্তরে-লক্ষ মুজিব

ঘরে ঘরে', 'মুজিব হত্যার পরিণাম-বাংলা হবে ভিয়েতনাম', আমরা সবাই মুজিব হবো-মুজিব হত্যার বদলা নেবো', ইত্যাদি।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের দিন থেকেই সামরিক সরকার এ ধরনের প্রতিবাদ প্রক্রিয়া যে ঘটবে তা আঁচ করতে পেরে দেশব্যাপী নেতা-কর্মীদের ব্যাপক ধরপাকড় ও নির্যাতন শুরু করে। প্রতিরোধযুদ্ধে পুলিশ, বিডিআর, সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে কয়েকশ যোদ্ধা নির্মম নির্যাতনের শিকার হন। সবমিলিয়ে মারা যান প্রায় ১০০ জন। তারা গ্রেপ্তার ও আত্মগোপনে থাকা অনেকের বিরুদ্ধে নানারকম মামলা দায়ের করে। ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামের সেনা ক্যাম্পগুলোতে কিছু সামরিক কর্মকর্তা গ্রেপ্তারকৃতদের বঙ্গবন্ধুর দালাল এবং সরকার উৎখাতের চেষ্টা করেছেন মর্মে স্বীকারোক্তি আদায়ের নামে অমানবিক নির্যাতন করেন। অন্তত ১০ জন ভুক্তভোগীর বর্ণনা অনুযায়ী টর্চার সেলে তাদের এমন নির্যাতন করা হয়, যা মনে পড়লে এখনো আঁৎকে ওঠেন তাঁরা। এরকম নির্যাতনে ঢাকার একটি কেন্দ্রে নির্যাতনে শহিদ হন একাত্তরে চট্টগ্রামের মুক্তিযোদ্ধা মৌলভি সৈয়দ আহমদ। এ ছাড়া, অনেকে গ্রেপ্তার এড়িয়ে ৭৫ থেকে ৮১ সাল পর্যন্ত হুলিয়া মাথায় করে এখানে সেখানে আত্মগোপনে থেকে দুঃসহ জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। কিন্তু সামরিক সরকারের রোষানলে পড়ার ভয়ে কোনো সংবাদ মাধ্যমে এসব তৎপরতার কোনো খবর প্রকাশ পায়নি। এছাড়া, এখনকার মতো কোনো বেসরকারি কোনো যোগাযোগ মাধ্যম না থাকায় সেই প্রতিবাদ- আন্দোলনের ইতিহাস চাপা পড়ে যায়। থেকে যায় সাধারণ মানুষের অগোচরে।

একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, অনেকটা গোপনে এবং বিক্ষিপ্তভাবে হলেও বঙ্গবন্ধু হত্যার এই প্রতিবাদী আন্দোলনের ফলে সারা দেশে দিশেহারা, ঝিমিয়ে পড়া বঙ্গবন্ধুর অনুসারীরা রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার ব্যাপারে নতুন করে সাহস ও প্রাণ ফিরে পায়। ফলে ঘরোয়া রাজনীতি শুরু হলে সংশ্লিষ্ট সবাই দলকে পুনর্গঠনে উৎসাহী ও উদ্যোগী হন, যার ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগকে সাংগঠনিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো সহজ হয়।

#

২৯.০৭.২০২১ পিআইডি ফিচার

লেখক: সম্পাদক-ইতিহাসের খসড়া, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষণাকর্মী। সহসভাপতি, বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী কেন্দ্রীয় পর্ষদ।